শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের দিব্য জন্ম ও কর্মতত্ত্ব

‘শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা’ কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাস রচিত ‘মহাভারতে’র ভীষ্ম পর্বের ২৫-৪২ এই ১৮টি অধ্যায়ে বিভক্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণী। এই গ্রন্থের ১৮টি অধ্যায়ের মধ্যে ‘জ্ঞানযোগ’ নামক চতুর্থ অধ্যায়ের নবম, দশম, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের দিব্যজন্ম ও কর্মতত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে।

‘দিব্য’ কথার অর্থ নির্মল ও অলৌকিক। এখানে শ্রীকৃষ্ণের দিব্য জন্ম ও কর্মতত্ত্ব বলতে বোঝায়---শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও কর্ম ব্যাপারকে লৌকিক দৃষ্টিতে না দেখে পারমার্থিক দৃষ্টিতে দেখা। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ‘জ্ঞানযোগ’ নামক চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে ভগবান্ কর্মযোগের পরম্পরা জানিয়ে তৃতীয় শ্লোকে তার প্রশংসা করেছেন। চতুর্থ শ্লোকে অর্জুন ভগবানের কাছে জন্মবিষয়ক প্রশ্ন করেছেন, পঞ্চম শ্লোকে ভগবান নিজের ও অর্জুনের বহু জন্ম হওয়ার কথা বলে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্লোকে নিজ অবতারতত্ত্বের রহস্য, তত্ত্ব , সময় ও নিমিত্তের বর্ণনা করে নবম, দশম, শ্লোকে যথাক্রমে জন্ম ও কর্মের দিব্যতা জানার ফল, দিব্য জন্ম ও কর্মতত্ত্বের পরম্পরাক্রমে আগমন, একাদশ থেকে পঞ্চদশ শ্লোকে শ্রীভগবান্ নিজ কর্মের দিব্যতা প্রতিপাদন করেছেন। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে শ্রীভগবান তাঁর দিব্য জন্মের সময়, হেতু ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করে তাঁর জন্ম ও কর্মের দিব্যতা সম্বন্ধে জানার ফল কী তা প্রতিপাদন করার জন্য তিনি বলেছেন-----

‘‘জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্তা দেহং পুনর্জন্মং নৈতি মামেতি সোঽর্জুনঃ।।’’

‘‘হে অর্জুন! আমার এই দিব্য জন্ম ও কর্ম যিনি তত্ত্বতঃ জানেন, তিনি দেহত্যাগ করিয়া পুনর্বার আর জন্মপ্রাপ্ত হন না।’’ এখানে শ্রীভগবানের দিব্য জন্মতত্ত্ব বলতে বুঝি সর্বশক্তিমান, পূর্ণব্রহ্ম পরমেশ্বর বাস্তবে জন্ম ও মৃত্যুর সর্বতোভাবে অতীত। তাঁর জন্ম জীবেদের মত নয়। তাঁর এই জন্ম নির্দোষ ও অলৌকিক। জগতের কল্যাণের জন্য ভগবান মনুষ্য প্রভৃতিরূপে জগতে প্রকটিত হন। তাঁর সেই বিগ্রহ প্রাকৃত উপাদানে সৃষ্ট হয় না। সেই বিগ্রহ দিব্য, চিন্ময়, প্রকাশমান, শুদ্ধ ও অলৌকিক হয়ে থাকে। তাঁর জন্মের কারণ কোনো গুণ বা কর্ম সংস্কার দ্বারা হয় না। তিনি মায়ার বশ হয়ে জন্মগ্রহণ করেন না। তিনি নিজ প্রকৃতির

অধিষ্ঠাতা হয়ে যোগশক্তির দ্বারা মনুষ্যাদিরূপে শুধুমাত্র লোকেদের দয়া করার জন্য প্রকটিত হন--এই বিষয় বুঝে নেওয়া অর্থাৎ এতে বিন্দুমাত্র ও অসম্ভব ব্যাপার ও বিপরীত চিন্তা না করে পূর্ণ বিশ্বাস করা এবং সাকাররূপ প্রকটিত ভগবানকে সাধারণ মানুষ মনে না করে সর্বশক্তিমান, সর্বেশ্বর, সর্বান্তযামী, সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দঘন পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মা বলে মনে করাই হল ভগবানের জন্মকে তত্ত্বতঃ দিব্য বলে মানা।

ভগবানের কর্ম দিব্য একথার অর্থ কী ? এবিষয়ে বলা যায়, ভগবানের কর্ম বলতে জগৎ-সৃষ্টি ও অবতার লীলারূপ কর্ম। ভগবান জগৎ সৃষ্টি ও অবতারলীলারূপ যেসকল কর্ম করে থাকেন এসবের মধ্যে তাঁর বিন্দুমাত্র স্বার্থ-সম্পর্ক থাকে না। কেবলমাত্র লোকের ওপর অনুগ্রহ করার জন্যই তিনি মনুষ্যরূপ অবতার ধারণ করে নানাবিধ কর্ম করে থাকেন। ভগবান নিজ প্রকৃতির দ্বারাও সমস্ত কর্ম করেও সেই কর্মের প্রতি তাঁর কর্তৃত্বভাব না থাকায় বাস্তবে তিনি কিছু করেনও না এবং সে সব কর্মে আবদ্ধও হন না। ভগবানের সেই কম্রফলে বিন্দুমাত্র ও স্পৃহা থাকে না। ভগবানের সমস্ত কর্ম প্রচেষ্টাই লোকহিতার্থে হয়-.----- ''পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।''

যে ব্যক্তি যেভাবে তাঁকে ভজনা করে, তিনি নিজেও সেইভাবে তাঁকে ভজনা করেন------''যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।'' এইভাবে ভগবানের সকল কর্ম আসক্তি, অহংকার, কামনাদি দোষ থেকে সর্বতোভাবে বর্জিত, নির্মল, শুদ্ধ ও শুধুমাত্র লোকের কল্যাণ করা এবং নীতি, ধর্ম, শুদ্ধ প্রেম, ভক্তি ইত্যাদি জগতে প্রচার করার জন্য ইহয়। এইসব কর্ম করলেও বাস্তবে ভগবানের সেই সব কর্মের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ থাকে না। তিনি সেসব থেকে সর্বতোভাবে অতীত ও অকর্তা -এইকথাগুলি ভালোভাবে বুঝে নেওয়া, এগুলির মধ্যে কোনো প্রকার বিপরীত চিন্তা না করে পূর্ণ বিশ্বাস রাখাই হল ভাগবানের কর্মগুলি তত্ত্বতঃ দিব্য বলে জানা। এইভাবে ভগবানের দিব্য জন্ম ও কর্ম যিনি জানেন তিনি তাঁকেই প্রাপ্ত হন ও তিনি মুক্ত হন। এইভাবে ভগবান তাঁর দিব্য জন্ম ও কর্মতত্ত্ব বলে এরপর কী উপায়ে তাঁর দিব্য জন্ম ও কর্মতত্ত্ব জানা যায় তা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন---- ''বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ।।''

এর অর্থ হল, বিষয়ানুরাগ, ভয় ও ক্রোধ বর্জন করে, আমাতে একাগ্রচিত্ত ও আমার শরণাপন্ন হয়ে, আমার জন্মকর্মে তত্ত্বালোচনারূপ জ্ঞানময় তপস্যা দ্বারা পবিত্র হয়ে অনেকে আমার পরমানন্দভাবে চিরস্থিতি লাভ করেছেন। অর্থাৎ **'যে বীতরাগভয়ক্রোধাঃ'** যাঁর রাগ, ভয় ও ক্রোধ দূর হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, আসক্তি হল 'রাগ', কোনোরূপ দুঃখের সম্ভাবনায় অন্তঃকরণে যে যে বিকার উৎপন্ন হয় তাকে বলা হয় 'ভয়', কেউ কোনো অপকার করলে বা নীতি বিরুদ্ধ বা মনের বিরুদ্ধ কাজ করলে মনে যে উত্তেজনার ভাব হয় , তাকে বলে 'ক্রোধ'। এই বিকার যে ব্যক্তির মধ্যে একেবারেই থাকে না, সেসকল ব্যক্তিদের বাচক হল **'বীতরাগভয়ক্রোধাঃ'** পদটি। এইরূপ ব্যক্তিরা ভগবানের দিব্য জন্ম ও কর্মতত্ত্ব জেনে থাকেন। আবার, **'যে মন্ময়াঃ'** অর্থাৎ অনন্য প্রেমপূর্বক আমাতেই যাঁর স্থিতি । এখানে 'মন্ময়াঃ' এই পদটির অথ্র সম্বন্ধে অনেক টীকাকার অনেক ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। টীকাকার শঙ্করাচার্য ও টীকাকার মধুসূদন সরস্বতী বলেছেন--**ব্রহ্মবিৎ, যিনি 'তৎ' রূপ ব্রহ্ম 'ত্বম্' রূপ জীবকে অভেদরূপে দেখেন।** আবার, টীকাকার শ্রীধর এর অর্থ করেছেন- **যিনি একমাত্র ভগবানেই চিত্ত সমর্পন করেছেন।** অর্থাৎ ভগবানের অনন্য প্রেম হওয়ায় যাঁরা সর্বত্র একমাত্র ভগবানকেই প্রত্যক্ষ করতে থাকেন তাঁদের বাচক এই 'মন্ময়াঃ' পদটি। অতএব, যাঁরা নিরন্তর ভগবানে তন্ময় হয়ে থাকেন এবং সর্বত্র ভগবানকে প্রত্যক্ষ করে থাকেন তাঁরাই তাঁকে প্রাপ্ত হন। আবার, **'যে মামুপাশ্রিতাঃ'** অথ্রাৎ ''যাঁরা আমাকে আশ্রয় করে থাকেন।'' যাঁরা ভগবানের জ্ঞানী ভক্ত সর্বভাবে তাঁর শরণাপন্ন হন, তাঁরা সর্বতোভাবে তাঁর উপরই নির্ভর করে থাকেন এবং শরণাগতির সমস্ত ভাব তাঁদের মধ্যে পূর্ণভাবে বিকশিত হয়, তাঁরাই ভগবানকে লাভ করে থাকেন। এইরূপ ভক্তগণ **'জ্ঞানতপসা'** জ্ঞানরূপ তপস্যা দ্বারা পবিত্র হয়ে ভগবানের স্বরূপ প্রাপ্ত হন। এরূপে ভগবানের জন্ম ও কর্মকে যারা দিব্য বলে জানে সেইসমস্ত ভক্তগণ কীভাবে ও কীরূপে তাঁকে লাভ করেন সেবিষয়ে বলতে গিয়ে ভগবান বলেছেন--------''যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্''। এর অর্থ হল, 'যে ভক্ত আমাকে যেভাবে ভজনা করেন, আমিও সেইভাবে তাঁর ভজনা করি।'ভগবানের এই কথা বলার তাৎপর্য এই যে, তাঁর ভক্তদের ভজনা করার প্রকার ভিন্ন ভিন্ন। নিজ নিজ চিন্তা অনুসারে ভক্তগণ তাঁর পৃক্‌পৃক্ রূপ মেনে থাকেন এবং নিজ নিজ মেনে নেওয়া অনুযায়ী তাঁর ভজন স্মরণ করেন। তাই

ভগবান ও তাঁর ভক্তদের চিন্তা অনুসারে সেই সেই রূপেই দর্শন দান করেন। একটু বিশদভাবে বলতে গেলে, শ্রীভগবান ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু, অহেতুক কৃপাসিন্ধু, ভাবগ্রাহী, অন্তর্যামী। যিনি তাঁকে যেভাবে উপাসনা করেন তিনি সেই ভাবেই তাঁকে সন্তুষ্ট করেন। যেমন-ব্রহ্মবাদীগণ অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞানে তাঁতেই নির্বাণ প্রাপ্ত হন। যোগীগণ পরমাত্মারূপী তাঁতেই কৈবল্যপ্রাপ্ত হন। কর্মিগণ কর্মপ্রবর্তক কর্মফলদাতা ঈশ্বররূপে তাঁকেই প্রাপপ্তহন । ঐশ্বর্যভক্তগণ বিধিমার্গে ঐশ্বর্যরূপী তাঁর ই সালোক্যাদি লাভ করেন । মাধুর্যভক্তগণ রাগমার্গে তাঁর ই নিত্য দাসাদি লাভ করে কৃতার্থ হন । যে যেপথ ই অনুসরণ করুক, সকল পথ ই তাঁকে প্রাপ্তির পথ। বর্তমান ধর্মসমন্বয়ের যুগ । ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমন্বয়-ধর্মের প্রধান উপদেষ্টা ও পথপ্রদর্শক। ‘যত মত তত পথ’-এটা তাঁর উপদেশ। কেবল উপদেশ নয় তিনি স্বীয় জীবনে বিবিন্ন সাধনপ্রনালী অবলম্বন করে বিভিন্ন সিদ্ধি লাভ করতঃ প্রত্যক্ষভাবে এ তত্ত্ব শিক্ষা দিয়ে গেছেন ।

‘‘যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্’’ ভগবানের এই কতা শুনে অজুন তাঁকে প্রশ্ন করেছেন--তুমি সর্বদেবময় সর্বেশ্বর , তবে তোমাকে ভগনা না করে লোকে অন্য দেবতার ভজনা কেন করেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান বলেন-----

‘‘ কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইই দেবতা।
ক্ষিপ্রং হি মনুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা।।’’

এই মনুষ্য লোকে কর্মের ফলাকাঙ্ক্ষী মানুষ দেবতাগণের পুজা করেন, কারণ কর্মজনিতসিদ্ধি তাঁরা শ্রীঘ্র ই লাভ করেন । জীব ভোগবাসনায় আকুল, তারা ধনৈশ্বর্যাদি নানরূপ ফলকামনা করে দেবতাদির নানারূপ পূজা অর্চনা করে । ইইলোকে এই কাম্যকর্মের ফল শ্রীঘ্র ই পাওয়া যায়। যা আপাতসুখকর ও সহজপ্রাপ্য, লোকে তাইই চায়। কিন্তু এসকল ফল সামান্য, ক্ষণস্থায়ী। নিষ্কাম কর্মের ফল মহৎ-নিষ্কাম কর্মের ফলেই লোকে তাঁকে প্রাপ্ত হন। কিন্তু তা দুষ্প্রাপ্য, কেননা অনাদি ভোগবাসনা নিয়ন্ত্রিত জীব সহজে কামনা ত্যাগ করতে পারে না, সুতরাং তাঁকেও প্রাপ্ত হন না।

শ্রীভগবানের দিব্য জন্ম ও কর্মতত্ত্ব জানার ফল ভগবানপ্রাপ্তি তা আগেই আলোচিত হয়েছে। এরপর ভগবান নিজ জগৎ সৃষ্টি কর্মে কর্তৃত্ব , বৈষম্য ও স্পৃহার অভাব দেখিয়ে নিজকর্মের দিব্যতার বিষয়ে

বলতে গিয়ে বলেছেন--‘‘-চাতুবর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিবাগশঃ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদধ্যকর্তারমব্যয়ম্।।’’

এর অর্থ হল-ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শুদ্র এই চারবর্ণসমুদায় গুণও কর্মের বিভাগ অনুসারে আমি সৃষ্টি করেছি। এই সৃষ্টি কর্মের কর্তা হলেও অবিনাশী, পরমেশ্বররূপ আমাকে তুমি প্রকৃতপক্ষে অকর্তা বলে জানবে।’’ শ্রীভগবান বলেছেন, গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে তিনি বর্ণচতুষ্টয় সৃষ্টি করেছেন। টীকাকার বলেন, ‘গুণ’ বলতে এখানে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ বোঝায়। সত্ত্বপ্রধান ব্রাহ্মণ-তাদের কর্ম অধ্যাপনাদি। অল্পসত্তবগুণবিশিষ্টজরঃপ্রধান ক্ষত্রিয়-তাদের কর্ম যুদ্ধাদে। অল্পতমোরজবিশিষ্ট রজঃপ্রধান বৈশ্য-তাদের কর্ম কৃষি-বাণিজ্যাদি। তমঃপ্রধান শূদ্র-তাদের কর্ম অন্য তিন বর্ণের সেবা। এইরূপে গুণানুসারে কর্মবিবাগ করে চাতুবর্ণের সৃষ্টি হয়েছে। এই জগৎ সৃষ্টি কর্মে ভগবানের বিন্দুমাত্র বৈষম্য নেই এই ভাব দেখাবার জন্য তিনি বলেছেন--‘আমি গুণ ও কর্ম অনুসারে চার বর্ণে রচনা ও বিভাগ করেছি।’ আবার,‘তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্’ ভগবানের এই উক্তির দ্বারা ভগবানের কর্মের দিব্যতার ভাব প্রকট হয়েছে। এর তাৎপর্য হল, ভগবানের কোনো কর্মেই রাগ-দ্বেষ ও কর্তৃত্বভাব থাকে না তিনি সর্বদাই সেই কর্মগুলি থেকে সর্বতোভাবে অতীত, তাঁর সকাশে তাঁর প্রকৃতি সমস্ত কম্র করে। তাই লৌকিক ব্যবহারে ভগবানকে ঐসব কম্রের কর্তা মানা হয় । কিন্তু ভগবান প্রকৃতপক্ষে সর্বতোভাবে উদাসীন, কর্মের সঙ্গে তাঁর কোনোপ্রকার সম্বন্ধ নেই। কর্মফলে তাঁর কোনো স্পৃহা নেই, তাই কর্মতাঁকে বদ্ধ করতে পারে না-- ‘ন মাংকর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।’ এখানে ভগবান উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা এই ভাব দেখিয়েছেন যে, কর্মের ফলরূপ কোনো ভোগে তাঁর বিন্দুমাত্র আসক্তি নেই। তাঁর দ্বারা যেসব কর্ম করা হয় তা কেবলমাত্র লোকহিতার্থে হয়ে থাকে। এইজন্য তাঁর সমস্ত কর্ম দিব্য এবং সেগুলি তাঁকে লিপ্ত বা আবদ্ধ করে না।

এইভাবে যিনি এটি বুঝে নেন যে জগৎ-সৃষ্টি ইত্যাদি সকল কর্ম করেও ভগবান প্রকৃতপক্ষে অকর্তা-ঐসব কর্মের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্বন্ধ নেই, তাঁর কর্মে বৈষম্যের লেশমাত্র নেই , কর্মফলে তাঁর বিন্দুমাত্রও আসক্তি, মমতা ও কামনা নেই --এই হল ভগবানকে তত্ত্বতঃ জানা। এইভাবে ভগবান তাঁর জন্ম ও কর্মের দিব্যতা ও সেটি তত্ত্বতঃ জানার মহত্ব প্রতিপাদন করেছেন।